

রামশরণ দারোগার গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

## ॥রামশরণ দারোগার গল্প॥

রামশরণবাবু আমাদের সাক্ষ্য-আড্ডায় নিত্যই আসেন, কিন্তু কথাবার্তা বড় একটা বলেন না। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের কর্মচারী, জীবনে অনেক জিনিসই দেখেছেন,—আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি দেখেছেন। কিন্তু তিনি এসেই একটা তাকিয়া আশ্রয় ক’রে সেই যে আড় হয়ে শুয়ে পড়েন, যতক্ষণ না আড্ডার শেষ লোকটি চলে যায়—ততক্ষণ তিনি চোখ বুজে এবং নিজে নিরীক থেকে অন্য সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মেয়েদের প্রেম ও তার মূল্য—এই ধরনের একটা আলোচনা চলছিল। এ সম্বন্ধে যার যা অভিজ্ঞতা সকলেই কোন-না-কোন ঘটনা বলছে। রামশরণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে চোখ বুজেই বলে উঠলেন, আমার চাকুরীজীবনে একটা ব্যাপার একবার ঘটেছিল, অনেকদিন হলেও এখনও ভুলিনি। আরও ভুলিনি এই জন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা সমস্যার মতো চিরকাল রয়ে গিয়েছে, যদিও কত জটিল সমস্যারই মীমাংসা করে বেড়িয়েছি সারা জীবনে! বলি শুনুন ঘটনাটা।

আমি তখন থাকি আলমপুর থানায়। কলকাতার অত কাছে বড় শহরের উপকণ্ঠে, চুরি জুয়াচুরির আড্ডা বেশি—একথা পুলিশ-কর্মচারী মাত্রই জানেন। এক মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিশ থেকে অন্ততঃ সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—আমাদের এলাকার কোন বাগান-বাড়ীতে একজন নোট জাল করছে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। আর সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—বাগান-বাড়ীতে বোমার কারখানা বসেছে, আমরা সে বিষয়ে কি খবর রাখি। ফেরারী আসামী তো হরদম পালিয়ে এসে আড্ডা নিচ্ছে আমাদের এলাকায়। একবার তো মুরশিদাবাদ জেলা থেকে—কে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইল থানারই পাশে আমাদের নাকের কাছে—এক খোলার ঘরে। তা ছাড়া বে-আইনী কোকেন, গুম, টাকা জাল, চোরাই মালের ব্যবসা, গুণ্ডামি প্রভৃতি প্রত্যেক হাঙ্গামার সঙ্গেই কি আলমপুর থানার এলাকাভুক্ত বাগান-বাড়ী ও বস্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?... অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—শতকরা নব্বুইটা হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নয়ত আলমপুর থানার ত্রিসীমানায় উক্ত দুর্বৃত্তের দল কখনো পদার্পণ করে নি, তবুও কলকাতা পুলিশের এনকোয়ারীর শ্লিপের ভিড়ে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত।

একদিন দুপুরের পর তেমন কাজকর্ম নেই, আমি রোদ পিঠে করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, শীতকাল—এমন সময় গাড়ীর শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি—একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী থেকে একজন স্ত্রীলোক থানার সামনেই নামছেন। তিনি থানার মধ্যে ঢুকে, আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দারোগাবাবু কোথায়?

—বলুন—আমিই।

তখন তিনি একখানা থামের চিঠি আমার হাতে দিলেন। খাম খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে বসতে বললুম। চিঠি লিখছেন নারী-কল্যাণ-আশ্রমের বিখ্যাত কর্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্তী। যোগেশবাবু আমার পরিচিত পুরাতন বন্ধুও বটে, তাঁর দ্বারা স্ত্রীলোকঘটিত নানা ঘটনায় পুলিশের অনেক উপকারও হয়েছে বটে। তাঁর বর্তমান পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নেই, মাত্র এইটুকু যে, যিনি এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যোগেশবাবুর পরিচিতা, তাঁর বক্তব্য কি, তা শুনে আমি যদি তাঁকে সাহায্য করি-তবে ভালো হয়।

আমরা পুলিশের লোক-কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস নয়! মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা এত দেখেছি যে, এতে আমাদের দোষ দেওয়া খুব বেশি চলে না। স্ত্রীলোকটিকে একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নিয়ে মনে হ'ল তাঁর বয়স চল্লিশের মধ্যে হবে। এক সময়ে খুব রূপসী ছিলেন। খুব সরল চরিত্রের মেয়ে নয়- একটু খেলোয়াড় ধরনের। অবস্থাও খুব ভালো নয়।

জিজ্ঞেস করলুম-আপনি কি চান?

তিনি উত্তরে যা বললেন, সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে-এখানকার কোন কালী-মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময়ে তাঁর অবস্থা খুব ভালো ছিল না বলেই ওরকম পাত্রে মেয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেয়েটি বড়ই কষ্টে আছেন। তিনি বর্তমানে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান-তাঁর নিজের কাছে। যোগেশবাবুর সাহায্যে মেয়েটিকে কোথাও লেখাপড়া কি নার্সের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন; মোটের উপর মেয়েকে তিনি এখানে রাখতে রাজী নন, এ বিষয়ে আমাকে তাঁর সাহায্য করতে হবে।

এত সংক্ষেপে তিনি কথাটা আমায় বলেন নি! স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি খুব। তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু ওই সঙ্গে আমায় শুনে যেতে হ'ল। তার মধ্যে দুটো কথা প্রধান। এক সময়ে তাঁর স্বামীর কত টাকা ছিল এবং তিনিও দেখতে এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন।

আমি বললুম-পুলিশের সাহায্য চান কেন? আপনি নিজেই কেন গিয়ে জামাইকে বলুন না?

তিনি বললেন-অনেকবার বলেছি, জামাই শোনে না, মেয়ে পাঠাবার মত নেই, অথচ তার দুর্দশার একশেষ করছে। আপনি নিজের চোখে গিয়ে দেখলেই সব বুঝবেন। আমি মেয়েমানুষ, আমার কোনো জোর খাটবে না তো, আমার সহায় নেই, সম্পত্তি নেই, কে আমার পক্ষ হয়ে দুটো কথা বলবে? তাই যোগেশবাবুকে ধরে আপনার কাছে আসা।

আমি বললুম-দেখুন, এতে পুলিশের কিছু করবার নেই। বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামীর। আপনার জামাই যদি মেয়েকে না আপনার সঙ্গে দেন, আমরা তাতে কি করব?-আপনার মেয়ের মত কি?

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—মেয়েরও মত নয় এখানে থাকা। তারপরে কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন—আমার এই উপকারটুকু করুন আপনি। মেয়েকে আমি নিয়ে যাবই। তার কষ্ট আর দেখতে পারিনে। আপনি একটু সহায় না হলে—আমার আর কোনো উপায় নেই—একটু দয়া করে, আপনাকে করতেই হবে। মার খেয়ে খেয়ে তার শরীরে আর কিছু নেই।

স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি আমার ভালো লাগল না। অনেক রকম লোক দেখেছি মশাই, ভালো-মন্দ সব রকম দেখে যদি একটু সিনিক হয়ে থাকি, তার জন্যে আমাদের বেশী দোষী ঠাওরাবেন না।

শেষ পর্যন্ত কতকটা উপরোধে পড়ে—কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গেলাম সেই কালীবাড়ী। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে থানায় বসিয়ে রেখে গেলাম। কালী-মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একতলা ঘরের একটা কুঠুরীতে পূজারী-ঠাকুর থাকে, সন্ধান নিলাম। পূজারীকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হ'ল না। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, একহারা পাকশিটে চেহারা। এই বয়েসেই চুলে বেশ পাক ধরেছে, দেখেই মনে হ'ল—নেশাখোর লোক। ধড়িবাজও বটে।

তাকে সব খুলে বললাম—পুলিশ দেখে সে জড়সড় হয়ে গিয়েছে। কাঁচু-মাচু ভাবে বললে—“আজ্ঞে বাড়ীতে যদি আপত্তি না করে, আপনি গিয়ে শাশুড়ী ঠাকুরগকে নিয়ে আসুন আমি পাঠিয়ে দেব। যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন দারোগাবাবু, আমার মোটেই আপত্তি নেই। একটা পেট আমার, যে-কোনো রকমে চালিয়ে নেব। বেশ, আপনি চলুন আমার বাসায়। আমার স্ত্রীকে বলুন—আমি সেখানে থাকব না।”

এর পরে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল, যা অতদিনের পুলিশ-জীবনে কখনো হয়নি। পূজারী যখন তার স্ত্রীকে দোর খুলতে বললে—আমরা তখন দোরের পাশে, কিন্তু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। দোর কে একজন এসে খুলতেই পূজারী-ঠাকুর বললে, দুটি ভদ্রলোক এসেছেন তোমার বাপের বাড়ী থেকে,—তোমার মায়ের কাছ থেকে, ওঁরা তোমাকে কি বলবেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি একটু জলটল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, আসুন আপনারা,—কথাবার্তা বলুন।... আসচি আমি।

ঘরের মধ্যে আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে আধ-ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে—কিন্তু অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি তো মশাই আমার জীবনে খুব বেশি যে দেখছি, এমন মনে হয় না। টকটকে গৌর বর্ণ—মাথায় ঘন কালো চুলের রাশ, প্রতিমার মতো মুখশ্রী, কি সুন্দর হাত পায়ের গড়ন,—কি সুন্দর ছোট্ট কপালখানি। আর চোখ—সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস তার চোখ, ডাগর ডাগর, ভাসা ভাসা, তুলি দিয়ে আঁকা টানা জোড়া ভুরু। কতদিন হয়ে গিয়েছে—এখনও সে চেহারা চোখের সামনে দেখছি।

ঘরে ঢুকে বললুম—“মা, আমাদের দেখে ভয় পেও না, লজ্জাও করো না। আমরা পুলিশের লোক। এখানকার থানা থেকে আসচি। তোমার মা খানিকটা আগে থানায় আসেন এবং আমাদের অনুরোধ করেন—তাকে সাহায্যে

করতে। তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান। তিনি থানায় বসে আছেন। তুমি যদি যাবার মত কর, তবে তাঁকে এখানে গাড়ী নিয়ে আসতে বলি। মেয়েটি একটিবার ঘাড় নেড়ে বললে—আমি যাব না।

ঘরের মধ্যে চার ধারে চেয়ে দেখি—এক কোণে একটা ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গ। তোরঙ্গটার ওপরে একটা কাঠ-বাঁধানো পুরোনো আয়না ও একটা কাঁচের তেল মাখবার বাটি; এক কোণে কতকগুলো ছেঁড়া-ধুকড়ি লেপ কাঁথা। ঘরের কড়ি টাঙানো গোটা দুই দড়ির শিকে। তাতে কলাইকরা জামবাটি বসানো। পেতল কাঁসার চিহ্ন নেই কোথাও। দারিদ্র্যের এমন রূপ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না।

মেয়েটির উত্তর শুনে বললুম—মা, যদি তোমার স্বামীর মতামতের বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, আমি বলছি তোমার মা যদি তোমায় নিয়ে যান, তোমার স্বামীর তাতে অমত নেই। আমার কাছে তিনি বলেছেন একথা। আসবার সময় সে-সব কথা হয়ে গিয়েছে।—কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে তুমি চলে আসতে পার। আর এখানে যে কষ্টে আছো দেখছি, তাতে আমার মনে হয়—তোমার যাওয়াই ভালো।

সে এবারও ঘাড় নেড়ে বললে,—না, আপনি মাকে গিয়ে বলুন—আমার যাওয়া যাবে না।

সে সুরের দৃঢ়তা এমনি যে, তার ওপর আর বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবুও আর একবার বললুম—দেখ মা, বেশ করে ভেবে দেখো, তোমার মা এসেছেন অনেক আশা করে। আমাদের সাহায্য চেয়েছেন বলেই আমরা এসেছি। অবিশ্যি এটাও আমরা দেখবো তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে, তোমার স্বামী তোমার ওপর কোনো রুঢ় আচরণ না করেন। সে বিষয়ে তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার।

মেয়েটি মুখ নিচু করে এবারও ঠিক আগের মতো সুরেই বললে—না আমি যাব না।

আমার কেমন একটু রাগ হ'ল—পুলিশে কাজ করে করে একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—কারোর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতাম না। একটু বিরক্তির সুরে বললুম—এই কষ্টে থাকবে, সেও ভালো? যাবে না তবুও? মেয়েটি চুপ করে রইলো। বেশ, না যাবি মরণে যা, তাতে আমার কি? বললুম—তা হ'লে একটা কাজ কর—না যাও সে তোমার ইচ্ছে। আমাদের কিছু বলবার বা জোর করবার নেই। তুমি একখানা পত্র লেখ তোমার মাকে, যে আমরা তোমাকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম,—তুমি যেতে রাজী হওনি, আমরা থানায় গিয়ে তাঁকে দেখাব।

কাগজ কলম আমরা দিলাম। মেয়েটি মেঝের ওপর বসে চিঠি লিখতে লাগল। ওর সুগৌর হাত দুটির ওপর সেই সময় ভালো ক'রে চোখ পড়তে দেখি একজোড়া রাঙা কড় ও নোয়া ছাড়া এমন সুশ্রী সুডৌল হাতে আর কিছু নেই।

আরও কষ্ট হ'ল ঘরের মেঝের অবস্থা দেখে। কি বিশ্রী সৈঁতসৈঁতে মেঝে, সপসপ করছে ভিজে। সদা-সর্বদা যেন জল উঠছে। এই মেঝের ওপর বিনা খাটে শোয় কি করে—এ আমার বুদ্ধির অতীত। অত্যন্ত সুস্থ লোকও তিন দিন এ রকমের শুধু মেঝের ওপর যদি শুয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই একটা কঠিন অসুখে পড়বে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অবাক হয়ে চেয়ে দেখি—মেয়েটি মুখ নিচু করে, পা ছড়িয়ে মেয়েলি ধরনে বাঁ-হাতের কমুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একদিকে কাত হয়ে বসে চিঠি লিখছে আর তার ডাগর চোখ দুটি বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, দু’ এক ফোঁটা জল চিঠির ওপরও পড়ল।

পুলিশের চাকুরিতে মন বেশ একটু কঠিন হয়ে গিয়েছিল বটে, তবু মেয়েটির নিঃশব্দ কান্না দেখে, ওর সংসারের এই নগ্ন দারিদ্র্য, নিরাভরণ ওই হাত দু’টি, এই সৈঁতসৈঁতে ঘরের মেঝে, ভাঙ্গা আয়নাখানা, ওই ধুকড়ি লেপ কাঁথা দেখে, তার ওপর ওর গাঁজাখোর মূর্খ স্বামীর কথা মনে হয়ে—না মশাই আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না—সুরটা নরম করেই বললুম—এই তো, মাকে চিঠি লিখতেই তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তবে কেন চল না, তাঁর সঙ্গে?

আমার সহানুভূতির সুর বোধ হয় ওর হৃদয় স্পর্শ করলে, বললে, সেখানে এর চেয়েও কষ্ট।

ওর সেই দৃষ্টিতে হতাশা, ঔদাসীন্য, মরীয়া ভাব—সব একসঙ্গে জড়ানো।

অবাক হয়ে বললুম—এর চেয়েও কষ্ট! এর চেয়ে আর কি কষ্ট থাকতে পারে?

মেয়েটি শান্ত, স্থির সুর বললে,—আপনি সব কথা জানেন না, বললুম যে আরও অনেক কথা আছে এর মধ্যে! সে সব কথা বলতে চাইনে। মাকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বলবেন, তোমার মেয়ে মরেচে আর তার খোঁজ কোরো না—

কথাটার শেষের দিকে রুদ্ধ-কান্নায় ওর গলার সুর আটকে গেল। আমিও চিঠিখানা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম। পথে দেখি পূজারী-ঠাকুর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে আসছে, আমাদের দেখে দাঁত বার করে বললে—‘হেঁ হেঁ, কি হ’ল দারোগাবাবু? যা বলেচি, তাই হ’ল কিনা? তা এখুনি চললেন যে.....একটু যৎসামান্য মিষ্টিমুখ—’

ওর ওপর রাগ কি হিংসে কি হ’ল জানিনে। তার সে সব আপ্যায়িতের কথা রুঢ়ভাবে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে বললুম—ওসব থাক্। একটা কথা বলি শোন ঠাকুর, কাল থানায় যেয়ো সকাল বেলা। একটা তক্তাপোশ সস্তায় নীলাম হবে। দাম তুমি যখন হয় দিও, কাল গিয়ে নিয়ে এসো সেখানা। বুঝলে?

পূজারী-ঠাকুর অবিশ্যি নিজের কাজ ভোলেনি। পরদিন সকালে এসে খাটখানা নিয়ে গিয়েছিল। এইখানেই আমার গল্পের শেষ।

আমরা এতক্ষণ একমনে শুনছিলুম। রামশরণবাবু চুপ করলে আমরা একজোটে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি আর কখনো সে মেয়েটিকে দেখতে যান নি?...

রামশরণবাবু বললেন-আর কিছুদিন আলমপুরে থাকলে হয়তো যেতুম। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যে বদলির হুকুম পেয়ে আলমপুর ছাড়তে হ'ল। তারপরে সে মেয়েটির আর কোন খবর জানি না। মেয়েটি কেন মায়ের সঙ্গে যেতে চাইল না, আমি আজও বুঝতে পারিনি।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM